The Jahangirnagar Review, Part-C, Vol. XXXII, pp 91-105, ISSN 2306-3920

বঙ্গবন্ধুর পররাষ্ট্রনীতির তত্ত্বীয় কাঠামো বিশ্লেষণ

আলী আকবর*

[**সার-সংক্ষেপ :** একটি দেশের পররাষ্ট্রনীতির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণের ক্ষেত্রে জাতীয় নেতার ভূমিকা অপরিসীম। জাতীয় নেতার ব্যক্তিত্ব, রাজনৈতিক প্রজ্ঞা এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতি সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে তৎকালীন রাজনৈতিক বাস্তবতায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে অসামান্য দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। বঙ্গবন্ধুর দৃঢ় ব্যক্তিত্ব, রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও কৌশলী সিদ্ধান্তের মাধ্যমে বাংলাদেশের জন্য একটি বাস্তবসম্মত পররাষ্ট্রনীতি ভিত্তি রচনা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। আমার এই প্রবন্ধে বঙ্গবন্ধুর পররাষ্ট্রনীতির সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া. তাঁর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা এবং কৌশলী সিদ্ধান্তের তৃত্তীয় কাঠামো বিশ্লেষণের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়েছে।]

ভূমিকা

পররাষ্ট্রনীতির মাধ্যমে একটি রাষ্ট্র অন্যান্য রাষ্ট্রের সঙ্গে তার সম্পর্কের ভিত্তি রচনা করে এবং জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণ করে থাকে। আধুনিক বিশ্বব্যবস্থায় কোন রাষ্ট্রই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে একটি রাষ্ট্রের অন্য একটি রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্কের মাত্রা, ক্রিয়াকলাপ ও নীতির ভিত্তিতে ঐ রাষ্ট্রের সক্ষমতা কিংবা আন্তর্জাতিক অঙ্গনে তার অবস্থান নির্দেশ করে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতার নেতৃত্ব দেওয়ার পাশাপাশি, স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশকে স্বমহিমায় তুলে ধরতে একটি বাস্তব সম্মত নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেন এবং তা বাস্তবায়নের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশকে তুলে ধরতে সক্ষম হন। তৎকালীন বিশ্বরাজনীতির দুই পরাশক্তির স্নায়ুযুদ্ধের বাস্তবতায় বঙ্গবন্ধু তাঁর নেতৃত্ব, রাজনৈতিক গুণাবলী ও প্রজ্ঞার মাধ্যমে একটি সময়োপযোগী পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারণ করতে সচেষ্ট ছিলেন। বঙ্গবন্ধুর পররাষ্ট্রনীতির মূল কথা ছিলো "Friendship to all, malice to none" অর্থাৎ সকলের সাথে বন্ধুত্ব কারোর সাথে শত্রুতা নয়। এই গবেষণা কর্মে তৎকালীন বাস্তবতায় বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়নের কৌশল ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বঙ্গবন্ধুর পররাষ্ট্রনীতির তত্ত্বীয় কাঠামো বিশ্লেষণের মাধ্যমে তুলে ধরা হল।

সাহিত্য পর্যালোচনা

সাহিত্য পর্যালোচনা গবেষণা কর্মের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ গবেষণা কর্মের বিষয়বস্তু নির্ধারণ, হাইপোথিসিস, গবেষণা পদ্ধতি, প্রকল্প গঠন, নানা ধরনের তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ, যাচাই-বাচাই, ফলাফল বিশ্লেষণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে তাত্ত্বিক কাঠামো ও প্রায়োগিক কৌশল নির্ধারণে সুস্পষ্ট ধারণা সৃষ্টিতে

* **ড. আলী আকবর :** সহযোগী অধ্যাপক, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।

সহায়তা করে থাকে। গবেষণাকর্মটি সম্পূর্ণ করতে বিভিন্ন একাডেমিক সাহিত্যের পাশাপাশি একাডেমিক জার্নাল, পত্রিকা, প্রবন্ধ পর্যালোচনা করেছি। গবেষণা বিষয় সংশ্লিষ্ট বেশ কিছু একাডেমিক সাহিত্য নীচে উপস্থাপন করা হলো। Valerie M. Hudson, Benjamin S. Day, *Foreign Policy Analysis: Classic and Contemporary*, Rowman & Littlefield, Second Edition 2014.

তিনটি অধ্যায়ে বিভক্ত বইটির প্রথম অধ্যায়ে লেখক পররাষ্ট্রনীতির বিবর্তন ও বর্তমান বাস্তবতা তুলে ধরা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে জাতীয় নেতার ভূমিকা, সংস্কৃতি, জাতীয় ঐতিহ্য, অভ্যন্তরীণ রাজনীতি, জনমত প্রভৃতি বিষয় পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে কিভাবে প্রভাব ফেলে সে বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। এবং বইটির তৃতীয় অধ্যায়ে পররাষ্ট্রনীতির তত্ত্বীয় দৃষ্টিকোণ এবং ভবিষ্যৎ নিয়ে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, *"বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বৃহৎ শক্তিবর্গের ভূমিকা"*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা (২০১৭)।

৬ টি অধ্যায়ে বিভক্ত বইটিতে লেখক বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামকে কেন্দ্র করে তৎকালীন পরাশক্তি বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং চীনের ভূমিকা তুলে ধরেছেন। প্রথম অধ্যায়ে তিন পরাশক্তির ভারতীয় উপমহাদেশের রাজনীতিতে নিজেদের সম্পৃক্তকরণ বিশেষ করে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বিপক্ষে তাদের অবস্থানের প্রেক্ষাপট বর্ণনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে তিন বৃহৎ শক্তির ভূমিকা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে সোভিয়েত ইউনিয়নের ভূমিকা বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে মার্কিন তৎপরতা এবং বাংলাদেশ বিরোধী বিভিন্ন কূটনৈতিক কার্যাবলি আলোচনা করা হয়েছে। পঞ্চম অধ্যায়ে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে কেন্দ্র করে বঙ্গপোসাগরে দুই পরাশক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের শক্তি প্রয়োগের কূটনীতির বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ড. মোহাম্মাদ জহুরুল ইসলাম, *বঙ্গবন্ধুর পররাষ্ট্রনীতি*, আগামী প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ ২০২০।

ছয় অধ্যায়ে বিভক্ত গ্রন্থটিতে লেখক বঙ্গবন্ধুর পররাষ্ট্রনীতির বিভিন্ন দিক নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। বইটির তৃতীয় অধ্যায়ে মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে বাংলাদেশ তথা মুজিবনগর সরকারের পররাষ্ট্রনীতিতে বঙ্গবন্ধুর প্রভাব নিয়ে বিস্তারিত তুলে ধরা হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে দক্ষিণ এশিয়ায় বঙ্গবন্ধুর পররাষ্ট্রনীতির বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণ করা হয়েছে। পঞ্চম অধ্যায়ে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং পূর্ব ইউরোপের দেশগুলোর সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর আমলে বাংলাদেশের সম্পর্কের রূপরেখা তুলে ধরা হয়েছে। এবং ষষ্ঠ অধ্যায়ে তৎকালীন বিভাজনের রাজনীতি থেকে দূরে থেকে বঙ্গবন্ধু জোট নিরপেক্ষনীতির বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। ড. জাহিদ হোসেন প্রধান, *Foreign Policy of Bangladesh (2008)*, ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, ২য় সংস্করণ ২০১১, ISBN 9848519998.

গ্রন্থটিতে ড. জাহিদ হোসেন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের প্রেক্ষাপট ও ইতিহাস নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এ গ্রন্থটিতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের ভূমিকা তুলে ধরা হয়েছে। এছাড়া স্বাধীনতা পরবর্তী নানা ঘটনা প্রবাহ বিশেষ করে বঙ্গবন্ধুর শাসনামলে পররাষ্ট্রনীতির যে লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা হয়েছিলো পরবর্তীতে ক্ষমতার পালাবদলের কারণে বিভিন্ন নীতির পরিবর্তন বিষয় তুলে ধরেছেন।

১৯৭৫ এর ১৫ আগস্ট পরবর্তী সময়ে কিভাবে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতিতে বঙ্গবন্ধুর নীতিকে বাদ দিয়ে খন্দকার মোশতাক ভারত ও সোভিয়েত মুখী পররাষ্ট্রনীতি থেকে সরে এসে পশ্চিমা আনুকূল্যের পররাষ্ট্রনীতি গ্রহণ করেছিল। শুধু তাই নয়, পরবর্তী সরকারগুলো একই ধারা কিভাবে অব্যাহত রেখেছে সে বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। এস আর চক্রবর্তী, *Foreign Policy of Bangladesh*, হর-আনন্দ পাবলিকেশন্স, ১৯৯৪। এই গ্রন্থটিতে লেখক অভ্যন্তরীণ, আঞ্চলিক প্রভাবগুলো বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি এবং দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলের অন্যতম শক্তিশালী দেশ ভারত এবং পাকিস্তানের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্কের রূপরেখা তুলে ধরেছেন।

পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়নে একজন নেতার ভূমিকা কি হওয়া উচিৎ এবং বঙ্গবন্ধুর শাসনামলের পররাষ্ট্রনীতির বিভিন্ন বিষয় আলোচনা করেছেন। এরপরে বইটিতে আলোচনা করা হয়েছে ১৯৭৫ পরবর্তী বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি গুলো কোন ভিত্তির উপর দাড়িয়ে ছিল। সেখানে বেশিরভাগ আলোচনার বিষয় ছিল অশান্ত রাজনৈতিক ইতিহাস এবং অর্থনৈতিক দূর্দশার কথা। আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবক হিসেবে ভারত কিভাবে তার আঞ্চলিক আধিপত্য বজায় রাখার চেষ্টা করেছে সেই বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক প্রভাবের গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে। এছাড়াও গ্রন্থটিতে আঞ্চলিক সহযোগিতা বৃদ্ধির জোর তাগিদ দিয়ে বাংলাদেশের উন্নয়নের জন্য আঞ্চলিক সহায়তা জোরদার করার কথা বলা হয়েছে। অধ্যাপক সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, *"বাংলাদেশ ও মুসলিম বিশ্ব ১৯৭২-১৯৮২"*, পুঁথি নিলয় প্রকাশনী: ঢাকা ২০২০।

বইটিতে লেখক বাংলাদেশের সঙ্গে মুসলিম দেশগুলোর তত্ত্বীয় কাঠামো বিশ্লেষণের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর শাসনামলে বাংলাদেশের সঙ্গে মুসলিম দেশগুলোর সম্পর্কের নির্ধারক সমূহ বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়া বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের বিভিন্ন অপপ্রচার ও প্রপাগান্ডা মোকাবেলা করে কিভাবে মুসলিম দেশগুলোর সঙ্গে সম্পর্কের গোড়াপত্তন করেছিলেন সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

বঙ্গবন্ধুর পররাষ্ট্রনীতির মূলনীতি

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর স্বাধীনতা অর্জনের পর পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশে ফিরে এসে দেশ পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। স্বাধীনতার অল্প সময়ের মধ্যেই বাংলাদেশের সংবিধান রচিত হয়। সংবিধানে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি ও বৈদেশিক নীতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ২৫(১) অনুচ্ছেদে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি ও বৈদেশিক সম্পর্কের বিষয়ে বলা হয়।

- জাতীয় সার্বভৌমত্ব ও সমতার প্রতি শ্রদ্ধা
- অন্যান্য রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা
- আন্তর্জাতিক বিরোধে শান্তিপূর্ণ সমাধান
- আন্তর্জাতিক আইন ও জাতিসংঘ সনদে বর্ণিত নীতিসমূহের প্রতি শ্রদ্ধা
- এই সকল নীতি হবে রাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ভিত্তি এবং এই সকল নীতির ভিত্তিতে রাষ্ট্র-

ক) আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে শক্তি প্রয়োগ পরিহার এবং সাধারণ ও সম্পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণের চেষ্টা করিবে।

খ) প্রত্যেক জাতির স্বাধীন অভিপ্রায় অনুযায়ী পথ ও পন্থার মাধ্যমে অবাধে নিজস্ব সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা নির্ধারণ ও গঠন অধিকার সমর্থন করিবে। এবং

গ) সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশিবাদ বা বর্ণবৈষম্যবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বের সর্বোত্র নিপীড়িত জনগণের ন্যায় সঙ্গত সংগ্রামকে সমর্থন করিবে (সংবিধান, ২০১৬: ৭)।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৬৩(১) নং অনুচ্ছেদে যুদ্ধ ঘোষণা সংক্রান্ত নীতি উল্লেখ করা হয়েছে। যেখানে বলা হয়েছে সংসদের সম্মতি ব্যতিত যুদ্ধ ঘোষণা করা যাবেনা। কিংবা প্রজাতন্ত্র কোন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবেনা (সংবিধান, ২০১৬: ৭)। সংবিধানের ১৪৫(ক) ধারায় বৈদেশিক চুক্তি সম্পর্কে বলা হয়েছে বিদেশের সাথে সম্পাদিত সকল চুক্তি রাষ্ট্রপ্রতির নিকট পেশ করা হবে এবং রাষ্ট্রপ্রতি তা সংসদে পেশ করার ব্যবস্থা করবেন। তবে শর্ত হচ্ছে যে, জাতীয় নিরাপত্তার সাথে সংশ্লিষ্ট অনুরূপ কোন চুক্তি কেবল মাত্র সংসদের গোপন বৈঠকে পেশ করা হবে (সংবিধান, ২০১৬: ৭)।

উপোরক্ত মূলনীতির আলোকে বঙ্গবন্ধুর পররাষ্ট্রনীতির লক্ষ্যসমূহ ছিলো-

ক) স্বাধীন দেশ হিসেবে বাংলাদেশের স্বীকৃতি অর্জন।
খ) ভারত এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে মর্যাদাপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখা।
গ) মুসলিম বিশ্বের সঙ্গে সম্পর্ক জোরদার করতে ওআইসিতে যোগদান।
ঘ) তৎকালীন অন্যতম পরাশক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন।
ঙ) জাতিসংঘের সদস্যপদ অর্জনের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশকে সম্মানের সহিত তুলে ধরা।

বঙ্গবন্ধুর পররাষ্ট্রনীতির তত্ত্বীয় কাঠামো বিশ্লেষণ

কোন দেশের পররাষ্ট্রনীতির তাত্ত্বিক কাঠামো বিশ্লেষণ করার ক্ষেত্রে সে দেশের জাতীয় নেতার ব্যক্তিত্ব এবং তাঁর আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক হিসেবে বিবেচিত হয়। Valerie M. Hudson তার Foreign Policy Analysis গ্রন্থে বলেন, "আন্তর্জাতিক সম্পর্ক গবেষণায় পররাষ্ট্রনীতি বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে শুধু কাঠামো বা ধারণা নয়, একজন ব্যক্তি পররাষ্ট্রনীতির গুরুত্বপূর্ণ কর্মক (Hudson & Benjamin, 2014: 10)।"

পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়নে একজন নেতা তাঁর বিশ্বাস, মূল্যবোধ, সংস্কৃতি, বিশ্বরাজনীতির বাস্তবতা বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকেন। বঙ্গবন্ধুর পররাষ্ট্রনীতি বিশ্লেষণ করলে আমরা তারই প্রতিফলন দেখতে পাই।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পররাষ্ট্রনীতি ছিল মূলত জোট নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি। যে বাস্তবতায় ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের সহায়তায় বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করেছিল তাতে রাজনৈতিক বিশ্লেষকগণ মনে করেছিলেন বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি অনেকটা ভারত ও সোভিয়েত মুখী হবে।

কিন্তু ১৯৭২ সালের ২ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সোভিয়েত ইউনিয়ন সফরে গেলে সেখানকার বিখ্যাত দু'টি পত্রিকা "প্রভদা" ও "ইজভেস্তিয়া" বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি কি হবে তা বঙ্গবন্ধুর নিকট জানতে চাইলে তিনি মন্তব্য করেন "বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির মূল লক্ষ্য হচ্ছে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান, জোটনিরপেক্ষতা, সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ ও জাতি বৈষম্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, সকল দেশের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক উন্নয়ন এবং আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা সুদৃঢ় করা (ইমাম, ২০১৩: ২৬৯-২৬৯)।"

বাস্তবেও বঙ্গবন্ধু জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনে যোগদান করে স্নায়ুযুদ্ধে বিভক্ত দুইপক্ষ থেকে সম-দূরত্ব বজায় রাখতে চেয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধুর জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনে যোগদানকে এরলিং বিজলের 'পাইলট ফিস' তত্ত্বের সাথে তুলনা করা যায়। পররাষ্ট্রনীতি এবং বড় রাষ্ট্রের সাথে ছোট রাষ্ট্রের সম্পর্ক কিভাবে নির্ধারিত হয় এবং ছোট রাষ্ট্র কিভাবে বড় রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক বজার রাখে তা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে ১৯৭০ এর দশকে সুইডিশ রাজনৈতিক বিশ্লেষক এরলিং বিজল, The Small States in International Politics, প্রবন্ধে Pilot-fish behavior তত্ত্বের মাধ্যমে ফিনল্যান্ড সোভিয়েত সম্পর্ক ব্যাখ্যা করেন (Bjol, 1971: 33)।

বিজল এই তত্ত্বের মূল বক্তব্য হলো পার্শ্ববর্তী বৃহৎ ও শক্তিশালী রাষ্ট্রের সাথে দ্বন্দ্বে না জড়িয়ে তার অবস্থানকে মেনে নিয়ে সুকৌশলে নিজের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। এক্ষেত্রে তিনি রূপক হিসেবে পাইলট নামের ছোট ছোট মাছের আচরণের কথা বলেছেন যারা হাঙ্গরের গা ঘেঁষে চলে বা এমন ভাবে গায়ে লেপ্টে থাকে যাতে হাঙর তাকে খেয়ে ফেলতে না পারে এবং এভাবেই এরা জীবন বাঁচায়। শক্তিশালী সোভিয়েত ইউনিয়নের থাবার মুখে কিভাবে তার সাথে ভালো সম্পর্ক রেখে ফিনল্যান্ড তার স্বাধীনতা ও সক্রীয়তা টিকিয়ে রেখেছিলো তিনি মূলত তাই ব্যাখ্যা করেছেন (Bjol, 1971: 33)।

বঙ্গবন্ধুর পররাষ্ট্রনীতির সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে লিডারশীপ তত্ত্ব এবং 'পার্সোনালিটি' তত্ত্বের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা যায়। পররাষ্ট্রনীতির সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে লিডারশীপ বা নেতৃত্বের গুণাবলী আর ব্যক্তিত্বের গুরুত্ব অপরিসীম। পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে লিডারশীপ বা নেতৃত্বের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে গিয়ে Michael Fole তার PoliticalLeadership: Themes, Contexts, & Critiques বইতে বলেন 'নেতার ক্ষমতা নির্ভর করেপারিপার্শ্বিক অবস্থা, রাষ্ট্রের আইনী কাঠামো, সাংগঠনিক কাঠামো, আমলাতন্ত্র এবং বিশ্ব রাজনীতি সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির উপর' (Michael, 2013: 5-6)।

আর নেতার ব্যক্তিত্ব ব্যাখ্যা করতে গিয়ে Breuning, Marijke তাঁর Foreign Policy Analysis: a comparative introduction বইতে বলেন, 'পররাষ্ট্রনীতি গ্রহণের ক্ষেত্রে একজন নেতার জন্য দুটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমটি হচ্ছে- রাষ্ট্রের কূটনৈতিক প্রতিনিধিত্বের আকার আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে অভ্যন্তরীণ জনপ্রিয়তা। বঙ্গবন্ধু এই দুটি বিষয়কে মাথায় রেখেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন (Marijke, 2007: 30)।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে বঙ্গবন্ধু ৮ই জানুয়ারী ১৯৭২ সালে পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তি লাভ করে পাকিস্তান থেকে লন্ডন ও দিল্লী হয়ে স্বাধীন বাংলাদেশে ফিরে আসেন। তিনি লন্ডন থেকে বাংলাদেশে ফেরার পথে ১০ই জানুয়ারী দিল্লী পৌঁছালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী মিসেস গান্ধী তাঁকে স্বাগত জানান। বঙ্গবন্ধু সেদিন তাঁর ব্যক্তিত্ব আর নেতৃত্বের জন্যই ইন্দিরা গান্ধীকে বলতে পেরেছিলেন 'আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধে সার্বিক সহায়তার জন্য আমরা ভারতের জনগণ আর সরকারের নিকট চির কৃতজ্ঞ। এবার আমি অনুরোধ করবো আমার দেশ থেকে ভারতের সৈন্য প্রত্যাহার করা হউক (https://www.globalsecurity.org/military/world/bangladesh/index.html)।

বঙ্গবন্ধু ৬ই ফেব্রুয়ারি ১৯৭২ সালে কলকাতা সফরে যান। দমদম বিমানবন্দরে তাঁকে অভ্যর্থনা জানান ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী। সফরকালে দ্বিপক্ষীয় বৈঠকে বাংলাদেশ থেকে ১৯৭২ সালের মার্চ মাসের মধ্যে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সকল ভারতীয় সৈন্য ফিরিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ভারত ১ মার্চ বাংলাদেশ থেকে সৈন্য প্রত্যাহারের ঘোষণা দেয় এবং ১৫ই মার্চের মধ্যেই ওই প্রত্যাহার প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয় (সেলিম, ২০০৯: ৮৭)।

পররাষ্ট্রনীতির সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে কৌশলগত অ্যাপ্রোচ অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কৌশলগত তত্ত্বের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে Harry R. Yarger বলেন 'কৌশলগত সিদ্ধান্ত সকল সম্ভাবনার দ্বার উম্মোচন করতে পারে, এর মাধ্যমে আমাদের সিদ্ধান্তের ঝুঁকি বিবেচনা করা হয় এবং আমাদের মিত্র এবং প্রতিপক্ষের জন্য সার্বিক বিষয় চিন্তা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ সহজতর হয়' (Yarger, 2006: 2)।

বঙ্গবন্ধু কৌশলগত কারণেই ১৯৭৪ সালে পাকিস্তানের লাহোরে অনুষ্ঠিত ইসলামি সম্মেলন সংস্থার (ওআইসির) অধিবেশনে যোগদান করেন। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা অর্জনের পরও পাকিস্তান বহিঃর্বিশ্বে নানান অপপ্রচার চালাতে থাকে। ফলে পাকিস্তানপন্থী মুসলিম দেশগুলো বাংলাদেশকে স্বীকৃতি জানাতে গড়িমসি করতে থাকে। ইসলামি সম্মেলন সংস্থার (ওআইসির) লাহোর সম্মেলনকে সামনে রেখে ২২ ফেব্রুয়ারী ১৯৭৪ পাকিস্তান স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে। মূলত পাকিস্তানের স্বীকৃতি অর্জনই ছিল বঙ্ধবন্ধুর ওআইসি সম্মেলনে যোগানের মূল লক্ষ্য। ওআইসি সম্মেলনে যোগদানের মাধ্যমে মুসলিম বিশ্বের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্কের গোড়া পত্তন হয়। বঙ্গবন্ধু মুসলিম বিশ্বের নেতৃবৃন্দের সামনে বাংলাদেশের অবস্থান তুলে ধরেন ফলে আরব বিশ্বের মুসলিম দেশগুলোতে বাংলাদেশ সম্পর্কে ইতিবাচক মনোভাব গড়ে ওঠে এবং নেতৃবৃন্দের সঙ্গে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন প্রতিষ্ঠিত হয় (https://dailyasianage.com/news/135593/a-tribute-to-bangabandhus-foreign-policy)।

বঙ্গবন্ধুর পররাষ্ট্রনীতি মূলত তিনটি ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। নিরাপত্তা, উন্নয়ন এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সাথে পারস্পারিক সহযোগিতার কূটনীতি। নিরাপত্তার অর্থ এই নয় যে ভূখন্ডগত নিরাপত্তা, বঙ্গবন্ধু নিরাপত্তা বলতে জ্বালানী, খাদ্য, পানি, পরিবেশ এবং ব্যক্তি নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে বৈদেশিক নীতি গ্রহণ করেছিলেন। বঙ্গবন্ধু নিরাপত্তার মানে বুঝতেন যে পরিবেশ ও অবকাঠামো ঠিক রেখে বৈদেশিক বিনিয়োগের দ্বার উম্মোচিত করলে বাণিজ্য বাড়বে এবং জাতীয় অর্থনীতিকে শক্তিশালী এবং উন্নত করবে। পরে দেখা যায় যে, বঙ্গবন্ধু পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে বৈশ্বিক বাস্তবতায় নিজ দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশের জন্য একটি শক্তিশালী পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়ন করেছিলেন।

বঙ্গবন্ধুর পররাষ্ট্রনীতির উল্লেখযোগ্য দিক

স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের স্বীকৃতি অর্জন

স্নায়ুযুদ্ধকালীন দ্বি-মেরুকেন্দ্রীক বিশ্ব রাজনীতির বাস্তবতায় দীর্ঘ নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা লাভের পর বঙ্গবন্ধুর সামনে বড় চ্যালেঞ্জ ছিল স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের স্বীকৃতি অর্জন করা। এ' ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধু তাঁর দক্ষ ও কৌশলী পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়নের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি আদায় করতে অনেকাংশেই সফল হয়েছিলেন। মূলতঃ ৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ ভারত ও ভূটানের স্বীকৃতি প্রদানের মাধ্যমে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের পথ চলা শুরু হয়েছিল এবং ১৯৭৪ সালে জাতিসংঘের সদস্য পদ লাভের মাধ্যমে এটি পূর্ণতা পায়। বঙ্গবন্ধুর কূটনীতি ও পররাষ্ট্রনীতিকে অনেকেই স্বীকৃতি আদায়ের কূটনীতি হিসেবেও অভিহিত করে থাকেন। অধ্যাপক ইমতিয়াজ আহমেদ ১৯৭১ সাল থেকে ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত সময়কালকে বাংলাদেশের স্বীকৃতি অর্জনের কূটনীতি হিসেবে অভিহিত করেন (Imtiaz, 2011: 207-218)।

স্বাধীনতা অর্জনের অল্প সময়ের মধ্যেই বাংলাদেশ বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের দেশগুলোর স্বীকৃতি অর্জন করার মাধ্যমে বাংলাদেশ বিশ্বদরবারে নিজেকে তুলে ধরতে সক্ষম হয়। ১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে বৃটেন, সুইডেন, নেদারল্যান্ড ও জাপান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে (আজাদ ২০২১)। ফলে ইউরোপে বাংলাদেশের কূটনৈতিক তৎপরতা জোরদার হয়। বঙ্গবন্ধুর পররাষ্ট্রনীতির অন্যতম সফলতা ছিল স্বাধীনতা যুদ্ধে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়া পরাশক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বীকৃতি আদায়। যুক্তরাষ্ট্র ১৯৭২ সালের এপ্রিলে বাংলাদেশকে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি প্রদান করে। এর ফলে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের ভাবমুর্তি উজ্জ্বল হয়।

ইসলামী সম্মেলন সংস্থা (OIC)'তে যোগদান কে সামনে রেখে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলিতে বাংলাদেশের স্বীকৃতি আদায়ের কূটনৈতিক তৎপরতা জোরদার করা হয় যার ফলশ্রুতিতে ১৯৭৪ সালের মধ্যেই ও,আই,সি ভুক্ত প্রায় ১৫টি মুসলিম রাষ্ট্র ইরাক, আলজেরিয়া, মৌরিতানিয়া, তিউনিশিয়া, মরক্কো, সিরিয়া, মিশর, জায়ারে, গ্যাবন, সুদান, লিবিয়া, কুয়েত, পাকিস্তান, তুরস্ক ও সংযুক্ত আরব আমিরাত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে (Anwar, 137)। ও,আই,সি-তে যোগদানকে সামনে রেখে পাকিস্তানের স্বীকৃতি অর্জন বাংলাদেশের স্বীকৃতি অর্জনের কূটনীতির অন্যতম সফলতা হিসেবে গণ্য করা হয়। ও,আই,সি-র সদস্য পদ লাভের পর মুসলিম বিশ্বে বাংলাদেশের কূটনৈতিক তৎপরতা আরও গতিশীল হয় এবং আরব বিশ্বের অন্যান্য মুসলিম দেশগুলোর স্বীকৃতি অর্জনের পথ সুগম হয়। এরপর নানা জটিলতা অতিক্রম করে ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে। জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির অন্যতম সফলতা।

এরপর বাংলাদেশ অন্যান্য দেশের স্বীকৃতি আদায়ের জন্য জোরালো কূটনৈতিক তৎপরতা চালায়। ফলস্বরুপ স্বাধীনতা অর্জনের মাত্র তিন বছরের মধ্যে অর্থাৎ ১৯৭৪ সালের মধ্যে বাংলাদেশ ১১৬ টি দেশের স্বীকৃতি লাভ করে এবং ২৫টি আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস্যপদ অর্জন করতে সক্ষম হয়

(Parliamentary Debates 1974)। এমনিভাবে দক্ষ কূটনৈতিক তৎপরতায় বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি আদায়ের ক্ষেত্রে সফলতার পরিচয় দিয়েছেন।

সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে মর্যাদাপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের সমর্থন ও ভূমিকা ছিল অপরিসীম। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় সোভিয়েত ইউনিয়ন কূটনৈতিকভাবে বাংলাদেশকে যেভাবে সহায়তা করেছিল তেমনি, স্বাধীনতার পরবর্তী সময়েও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস্যপদ লাভ ও সোভিয়েতপন্থী দেশ গুলোর স্বীকৃতি আদায়ের ক্ষেত্রেও বিশেষ ভূমিকা পালন করে। তাই স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে বঙ্গবন্ধু সোভিয়েত ভূমিকাকে কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করেন।

দু'দেশের সম্পর্ক জোরদার করতে বঙ্গবন্ধু সোভিয়েত সরকারের আমন্ত্রণে ১৯৭২ সালের ২ থেকে ৬ মার্চ সোভিয়েত ইউনিয়ন সফর করেন (ইসলাম ২০২০: ১৮৫)। বঙ্গবন্ধু সোভিয়েত সফরের প্রাক্কালে বিমান বন্দরে সমবেত সাংবাদিকদের বলেন,"সোভিয়েত জনগণ ও নেতৃবৃন্দের জন্য বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের সুভেচ্ছা ও ভালোবাসা নিয়ে যাচ্ছি (দৈনিক বাংলা, ২০ মার্চ ১৯৭২)।" বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ডানকোভা বিমান বন্দরে পৌঁছালে সোভিয়েত সরকার ও সাধারণ মানুষের পক্ষ থেকে তাঁকে গণসংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয় (ইসলাম ২০২০: ১৮৭)। এ সফরে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক লিভলিদ ব্রেজনেভের উদ্যোগে বঙ্গবন্ধুকে বিরল সম্মানের অংশ হিসেবে বিমান বন্দর থেকে তাঁকে সরাসরি ক্রেমলিনে নিয়ে যাওয়া হয়। ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ছাড়া ইতিপূর্বে আর কোন বিদেশী নেতাকে এই সম্মান দেওয়া হয়নি (ইসলাম ২০২০: ১৮৭)।

বঙ্গবন্ধুর সোভিয়েত ইউনিয়ন সফরে সবাই সতর্ক দৃষ্টি রাখছিলেন। এ সফরে সোভিয়েত বাংলাদেশ সম্পর্কের গতি প্রকৃতি কি হতে যাচ্ছে কিংবা বাংলাদেশ কি সোভিয়েত ইউনিয়নের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সোভিয়েত পন্থী পররাষ্ট্রনীতি অবলম্বন করবে কিনা, সেটা সকলের কাছে স্পট লাইটে পরিণত হয়। কিন্তু সকলের উৎকণ্ঠার জবাবে দুটি সোভিয়েত পত্রিকা প্রভাদ ও ইজভেস্তিয়া কে দেওয়া স্বাক্ষাতকারে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কি হবে তা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, "বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির মূল লক্ষ্য হচ্ছে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান, জোট নিরপেক্ষ সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ ও জাতি বৈষম্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, সকল দেশের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক উন্নয়ন এবং আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা সুদৃঢ় করা (ইমাম ২০০৪: ২৬৮-২৬৯)।" এমনভাবে বঙ্গবন্ধু সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে একটি মর্যাদাপূর্ণ সম্পর্কের সূচনা করেছিলেন। বঙ্গবন্ধু সোভিয়েত ইউনিয়ন সফরকালে দুদেশের সরকারী পর্যায়ে বিভিন্ন বিষয় আলোচনা হয়। বিশেষ করে যুদ্ধবিদ্ধস্ত বাংলাদেশ পূনর্গঠনের বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে আলোচিত হয়। বাংলাদেশের পূনর্গঠনের সহায়তার লক্ষে ২ মার্চ ১৯৭২ সোভিয়েত ইউনিয়ন ও বাংলাদেশের মধ্যে ৩৩০ কোটি টাকার একটি অর্থনৈতিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। যার মধ্যে দুইটি সাহায্য চুক্তি এবং একটি বাণিজ্য চুক্তি অন্তর্ভুক্ত ছিলো (Mustofa & Kabir 2013: 32)। ১৯৭২ সালের ৪ মার্চ উভয় দেশ এক যুক্ত ইশতেহারে স্বাক্ষরের মাধ্যমে দুদেশের মধ্যে অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক সম্পর্ক জোরদার করার উপর গুরুত্বারোপ করেন (Mustofa & Kabir 2013: 32)।

উক্ত ইশতেহারের আলোকে বঙ্গবন্ধুর সোভিয়েত ইউনিয়ন সফর কালেই মস্কোতে বাংলাদেশ মিশন স্থাপিত হয় এবং জনাব শামসুর রহমান বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত হন (ইসলাম ২০২০: ১৯১)। এর মাধ্যমে দুদেশের মধ্যে আনুষ্ঠানিক কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। সোভিয়েত ইউনিয়নে বাংলাদেশের নবনিযুক্ত রাষ্ট্রদূত তাঁর পরিচয়পত্র পেশ করে স্থানীয় সাংবাদিক ইউ মরোলভ ওজির সাথে আলাপচারিতায় নিজের অনুভূতি ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন," মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম মিত্র সোভিয়েত

ইউনিয়নের ক্রেমলিনে পরিচয়পত্র পেশ করা আমার জীবনে স্বরণীয় ঘটনা কেননা আমি আমার মাতৃভাষা বাংলায় সোভিয়েত ইউনিয়নের মত বৃহৎ দেশে নিজের পরিচয় উপস্থাপন করতে পেরেছি (ইসলাম ২০২০: ১৯১)।" এভাবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে মর্যাদাপূর্ণ সম্পর্কের সূচনা করে ছিলেন।

১৯৭২ সালের ৬ই মার্চ সোভিয়েত ইউনিয়ন সফর শেষে ঢাকা ফিরে বিমানবন্দরে এক সংক্ষিপ্ত ভাষণে বঙ্গবন্ধু বলেন, যে ভালোবাসা সোভিয়েত সরকার ও জনগণ থেকে আমি ও আমার সহকর্মীরা পেয়েছি সে ভালোবাসা শুধু আমাকে দেখানো হয় নাই, সাড়ে সাত কোটি বাংলার জনগণকে দেখানো হয়েছে (ইসলাম ২০২০: ১৯১)।

ভারতের সাথে অধিকার ও মর্যাদার সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে ভারতের অবদান ছিল অপরিসীম। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মুক্তিযুদ্ধে সর্বাত্মক সহযোগিতা ও সমর্থনের জন্য ভারতের অবদানকে কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করেন। স্বাধীনতার পর পাকিস্তানের কারগার থেকে মুক্তি লাভের পর লন্ডন হয়ে বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তনের প্রাক্কালে দিল্লিতে যাত্রা বিরতি করেন। এ সময় বঙ্গবন্ধুকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করে ভারতের রাষ্ট্রপতি ভি. ভি. গিরি বলেন, "আমরা দুটি দেশ বন্ধুত্বের দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ এবং উভই দেশই গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা এবং সমাজতন্ত্রের আদর্শে বিশ্বাসী (Bangladesh Document 1999: 605)।" ভারতের রাষ্ট্রপতির বক্তব্যের জবাবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কৃতজ্ঞচিত্তে ভারতের জনগণ, সরকার এবং প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেন,"এই যাত্রাকে সম্ভব করার জন্য আপনারা সকলেই অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন এবং সাহসিকতার সাথে আত্মত্যাগ করেছেন। এই যাত্রা অন্ধকার থেকে আলোতে, বন্দীদশা থেকে মুক্তির দিকে (Bangladesh Document 1999: 606)।"

এমনি বাস্তবতায় ভূরাজনীতি, ভৌগলিক অবস্থান ও মুক্তিযুদ্ধে ভারতের প্রত্যক্ষ সহায়তার জন্য সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতিতে ভারত একটি গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টরে পরিণত হয়। কিন্তু বঙ্গবন্ধু ভারতের দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে বরং ভারতের সাথে মর্যাদা ও অধিকার রক্ষার পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়নের প্রয়াস চালিয়ে অনেকাংশেই সফলতা অর্জন করতে সক্ষম হন। যার ফলে স্বাধীনতার অল্প সময়ের মধ্যেই বাংলাদেশ থেকে ভারতীয় সৈন্য প্রত্যাহার করা সম্ভব হয়।

বাংলাদেশ ভারত দ্বি-পাক্ষিক বিভিন্ন বিষয়ে বঙ্গবন্ধু মর্যাদার সাথে আলোচনার ভিত্তিতে সমাধান করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ফলে দু'দেশের মধ্যে পানি বন্টন সমস্যা কূটনৈতিক উপায়ে সমাধান করার উদ্যোগ নেওয়া হয়। সীমান্ত সমস্যা সমাধানের জন্য ১৯৭৪ সালে মুজিব-ইন্দিরা সীমান্ত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ফলে দেখা যায় বঙ্গবন্ধু ভারতের সাথে নতজানু পররাষ্ট্রনীতি নয় বরং মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠার পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়ন করতে উদ্যোগী ছিলেন।

পাকিস্তানের স্বীকৃতি আদায় ও OIC তে যোগদান

বঙ্গবন্ধুর পররাষ্ট্রনীতির একটি অন্যতম সফলতা হচ্ছে তৎকালীন সময়ে Organization of Islamic Conference (OIC) তে যোগদান কে সামনে রেখে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে পাকিস্তানের স্বীকৃতি অর্জন করা। কেননা দীর্ঘ নয় মাস পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে স্বাধীনতা অর্জনের অল্প সময়ের মধ্যে পাকিস্তান স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিলে মুসলিম বিশ্বের পাকিস্তান পন্থী দেশগুলোর স্বীকৃতি অর্জনের পথকে আরো সুগম করেছিলো। পাশাপাশি আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলেও বাংলাদেশের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়।

তবে ও,আই,সি-র সদস্যপদ লাভ খুব সহজ ছিলো না। মুক্তিযুদ্ধকালীন সময় থেকেই পাকিস্তান মুসলিম বিশ্বে বাংলাদেশ বিরোধী প্রচারণা চালায়। ফলে মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানী বর্বরতা মুসলিম বিশ্ব

অবগত ছিলো না। যে কারণে কিছু মুসলিম দেশ মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের পক্ষে অবস্থান নিলেও সৌদি আরব, জর্ডান, লিবিয়া, মরক্কো পাকিস্তানের পক্ষ অবলম্বন করে। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়েও এই ধারা অব্যাহত থাকে। বঙ্গবন্ধু রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিতে ধর্ম নিরপেক্ষতা অন্তর্ভুক্ত করলে পাকিস্তান মুসলিম বিশ্বে পুনরায় অপতৎপরতা চালাতে শুরু করে। বাংলাদেশ সরকার মুসলিম বিশ্বের দেশ গুলোর সাথে সম্পর্ক উন্নয়নে জোর দেয়। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মুসলিম দেশ সফর করেন বিশেষ করে আরব বিশ্বের দেশগুলিতে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির লক্ষ্যমাত্রা তুলে ধরেন।

ফল স্বরুপ আফ্রো-এশিয়া সংহতি সংস্থার সাথে বাংলাদেশের কূটনৈতিক তৎপরতা জোরদার হয়। ১৯৭২ সালে ১০ জানুয়ারী মিশরের কায়রোতে আফ্রো-এশিয়ান সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনে চার সদস্য বিশিষ্ট বাংলাদেশ প্রতিনিধি দল যোগদান করেন। বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের প্রধান ছিলেন মোল্লা জালাল উদ্দীন এমএনএ (Mustofa & Kabir 2013: 22)। এ সম্মেলনে মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানী বর্বরতা ও গণহত্যার বিষয় বিস্তারিত আলোচনা করা হয় ফলে বাংলাদেশের প্রতি মুসলিম দেশগুলোর দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন হয় এবং ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির সূচনা হয়। বাংলাদেশ আফ্রো-এশীয় সংস্থার সদস্যপদ লাভ করে।

১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারী-মার্চে জেদ্দায় অনুষ্ঠিত ও,আই,সি-র পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু অংশগ্রহণ করেন (ইসলাম ২০২০: ৩০৪)। এই সম্মেলনে বঙ্গবন্ধুর সাথে ভুট্টোর বৈঠকের কথা থাকলেও শেষ পর্যন্ত নানান কূটনৈতিক অপতৎপরতার কারণে এ সম্মেলনে শেষ পর্যন্ত মুজিব-ভুট্টো বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় নি। ১৯৭৩ সালের লিবিয়ার বেনগাজীতে ও,আই,সি-র সম্মেলনের সমাপ্তি অধিবেশনে ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়া বাংলাদেশকে পরবর্তী সম্মেলনে অংশ গ্রহণের আবেদন জানায় (ইসলাম ২০২০: ৩০৫)। পরবর্তী সময়ে বঙ্গবন্ধু মুসলিম বিশ্বে কূটনৈতিক তৎপরতা জোরদার করেন। আরব-ইসরাইল যুদ্ধে বঙ্গবন্ধু আরবদের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জ্ঞাপন করেন এবং আরবদের সহায়তার জন্য মেডিকেল টিম প্রেরণ করেন। ফলে আরব বিশ্বের মুসলিম দেশগুলোতে বাংলাদেশ সম্পর্কে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির সূচনা হয়। এটা বাংলাদেশের একটি কূটনৈতিক সফলতা বটে। আরব-ইসরাইল যুদ্ধ চলাকালে মিসরের একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা বলেন, "আমরা এতদিন পাকিস্তানের প্রচারণা বিশ্বাস করে এসেছি। আপনাদের মুক্তিসংগ্রাম সম্পর্কে আমরা সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিলাম। এখন আমরা উপলব্ধি করছি যে, ইয়াহিয়া চক্রের দ্বারা সংগঠিত অপরাধ প্রধানমন্ত্রী ভুট্টোরও যোগসাজ ছিল (ইমাম ২০০৪: ২৮০)।"

বঙ্গবন্ধুর দক্ষ কূটনৈতিক তৎপরতার মাধ্যমে আরব বিশ্বে বাংলাদেশ সম্পর্কে ইতিবাচক মনোভাব গড়ে উঠে। মুক্তিযুদ্ধকালীন বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে তাজউদ্দীন আহমেদ আরব বিশ্বে কিছু তিক্ত অভিজ্ঞাতর সম্মুখীন হয়েছিলেন। ফলে ও,আই,সি-র শীর্ষ অধিবেশনে যোগদানের ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধুর সাথে তাজউদ্দীন আহমেদের মত পার্থক্য দেখা দেয় (ইমাম ২০০৪: ২৮০)। কিন্তু বঙ্গবন্ধু তৎকালীন রাজনৈতিক বাস্তবতায় ও,আই,সি-তে যোগদানের প্রত্যাশী ছিলেন। ১৯৭৪ সালের লাহোর শীর্ষ সম্মেলনের পূর্বে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এক বক্তব্যে উল্লেখ করেন,"যদিও বাংলাদেশের শতকরা ৮০ ভাগ মুসলমান অধ্যুষিত একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হওয়া সত্ত্বেও আমরা ইসলামী শীর্ষ সম্মেলনে যোগদিতে আগ্রহী (ইসলাম ২০২০: ৩০৭)।"

বঙ্গবন্ধুর বক্তব্যটি বিবেচনায় নিয়ে কূটনৈতিক তৎপরতা চলতে থাকে। এ সময় বাংলাদেশের লক্ষ্য ছিল পাকিস্তানের স্বীকৃতি আদায় এবং OIC-তে যোগানের মাধ্যমে মুসলিম বিশ্বের সাথে সম্পর্ক উন্নয়ন। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর শর্ত ছিলো পাকিস্তান স্বীকৃতি দিলেই কেবল বাংলাদেশ লাহোরে অনুষ্ঠিত ও,আই,সি-র সম্মেলনে যোগদান করবে। পাকিস্তানের বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদানের

বিষয়ে কূটনৈতিক তৎপরতার অংশ হিসেবে ও,আই,সি-র মহাসচিব মিশরের হাসান আল তোহামি ৪ ফেব্রুয়ারী ১৯৭৪ বাংলাদেশ সফরে আসেন (ইসলাম ২০২০: ৩০৭)। বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা শেষে তোহামী সাংবাদিকদেরকে বলেন যে, ওআইসি'র অধিকাংশ সদস্য রাষ্ট্রই বাংলাদেশকে আসন্ন লাহোর সম্মেলনে যোগদানের বিষয়ে ইতিবাচ দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করেন (ইসলাম ২০২০: ৩০৭)। বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের স্বীকৃতি প্রদানের নিজ শর্তে অবিচল ছিলেন। এই প্রেক্ষিতে তোহামী বলেন, "We wish, pray and hope to Bangladesh in the conference. More efforts are needed from our side to reach the goal (Morning News, 6 February 1974)."

হাসান তোহামী পাকিস্তানী স্বীকৃতি প্রদানের বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে অধিকতর আলোচনার জন্য তাঁর সফরসূচী পরিবর্তন করে কায়রো জেদ্দার পরিবর্তে দিল্লী পিন্ডি সফরে যান। বাংলাদেশও কূটনৈতিক তৎপরতা অব্যাহত রাখে। এরই ধারাবাহিকতায় ৬ ফেব্রুয়ারী ১৯৭৪ পররাষ্ট্রমন্ত্রী কামাল হোসেন আলজেরিয়া সফরে যান (ইসলাম ২০২০: ৩০৮)। এক সপ্তাহ আলজেরিয়া সফর শেষে দেশে ফিরে তিনি বাংলাদেশের লাহোর শীর্ষ সম্মেলনে যোগদানের বিষয়ে আলজেরিয়া ইতিবাচক মনোভাব প্রকাশ করেছে বলে সাংবাদিকদের অবগত করেন (Bangladesh Observer, 13 February 1974)। অন্যদিকে পাকিস্তানের বিশেষ অনুরোধে মিশরের রাষ্ট্রপতি আনোয়ার সাদাত ১২ ফেব্রুয়ারী ১৯৭৪ মিশরের কায়রোতে বাংলাদেশের বিশেষ প্রতিনিধি বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী ও পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আজিজ আহমেদের সাথে পৃথক বৈঠকে মিলিত হয়। কিন্তু বাংলাদেশ পূর্ব শর্তে দৃঢ় থাকায় কোন অগ্রগতি ছাড়াই বৈঠক শেষ হয় (ইসলাম ২০২০: ৩০৮)। অপর দিকে বাংলাদেশের স্বীকৃতির ব্যাপারে ১৬ ফেব্রুয়ারী ১৯৭৪ পাকিস্তান ভারতে বন্দী ১৯৫ জন পাকিস্তানী যুদ্ধবন্দীর কোন বিচার করা হবে না এবং মুক্তি দিতে হবে এই মর্মে শর্ত আরোপ করে (ইসলাম ২০২০: ৩০৯)। বাংলাদেশ পাকিস্তানের এ শর্তে সাড়া না দেওয়ায় এ ক্ষেত্রে কোন অগ্রগতি হয় নি।

পরবর্তীতে সোমালিয়ার প্রস্তাবে ২০ ফেব্রুয়ারী ১৯৭৪ সালে কুয়েতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী শেখ সাবাহ আল জাবেরের নেতৃত্বে ৭ মুসলিম দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা ঢাকায় আগমন করেন (ইসলাম ২০২০: ৩০৯)। বাংলাদেশের ও,আই,সি-তে যোগদানের প্রশ্নে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে প্রতিনিধি দলের দীর্ঘ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। অতঃপর প্রতিনিধি দল ২২ ফেব্রুয়ারী ১৯৭৪ বাংলাদেশ থেকে পাকিস্তানের লাহোর গমন করে ক্ষমতাসীন দলের নেতৃবৃন্দের সাথে বৈঠকে বসেন। দীর্ঘ আলোচনা শেষে প্রাদেশিক গভর্ণর ও আইন পরিষদের যৌথ সভায় পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি জুলফিকার আলী ভুট্টো ২২ ফেব্রুয়ারী ১৯৭৪ বাংলাদেশকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি প্রদানের ঘোষণা দিয়ে বলেন, "With the name of Allah on my lips and in the name of Pakistan Government, I now announce on behalf of the Government of Pakistan that we recognize Banhladesh as from today. The recognition was in interest of Pakistan and Islamic Unity (সাকী ১৯৯৫-১৯৯৭: ২১১)."

পাকিস্তানের আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি প্রদানের পর বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে ও,আই,সি-তে যোগদানের বিষয় নিশ্চিত করা হয়। এরপর ২৩ ফেব্রুয়ারী ১৯৭৪ আলজেরিয়ার প্রেসিডেন্ট বুমেদিনের পাঠানো ব্যক্তিগত বিমানে বঙ্গবন্ধু ২২ সদস্যের প্রতিনিধি দল নিয়ে লাহোরে পৌঁছেন (ইসলাম ২০২০: ৩০৯)। বঙ্গবন্ধু বিমান থেকে অবতরণের পর প্রথমবারের মত পাকিস্তানের মাটিতে বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত 'আমার সোনার বাংলা' বাজানো হয় (ইসলাম ২০২০: ৩০৯)। টিক্কা খান নত মস্তকে বঙ্গবন্ধুর সাথে করমর্দন করেন। রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক ক্ষেত্রে আরব বিশ্বে এটি ছিল বঙ্গবন্ধুর বিরাট কূটনৈতিক সফলতা।

যুক্তরাষ্ট্রের স্বীকৃতি আদায় ও সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠা

বঙ্গবন্ধুর পররাষ্ট্রনীতির অন্যতম সফলতা হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়া তৎকালীন বিশ্ব রাজনীতির অন্যতম পরাশক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বীকৃতি অর্জন ও সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা। তবে মার্কিন স্বীকৃতি অর্জন ও সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠা খুব সহজ ছিল না। স্বাধীনতা যুদ্ধকালীন ইন্দো-সোভিয়েত অক্ষ এবং চীন-মার্কিন অক্ষের যে কূটনৈতিক যুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করে, সেই বাস্তবতায় যুক্তরাষ্ট্রের স্বীকৃতি আদায় করতে বঙ্গবন্ধুকে কৌশলী নীতি অবলম্বন করতে হয়েছিলো। অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্রও দক্ষিণ এশিয়াতে তার নীতি পুনঃবিন্যাস করার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। বঙ্গবন্ধু তাঁর পররাষ্ট্রনীতিতে, জোটনিরপেক্ষ নীতি অনুসরণ করলে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক উন্নয়নের পথ সুগম হয়।

তথাপি পাকিস্তান ও চীন সরকারের প্রভাবের কারণে যুক্তরাষ্ট্রের বাংলাদেশকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি প্রদানের ক্ষেত্রে কোন ইতিবাচক পদক্ষেপ নেওয়া থেকে বিরত রাখে। ১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নিক্সন এক বিবৃতিতে বলেন, "On the political side, we considered the entire relationship with the subcontinent. As part of the relationship, of course, 70 million people in Bangladesh are involved. We haven't made an approval decision yet, and you shouldn't expect a decision until I return from China (Nixon's statement at a news conference on 10 February 1972: 292)."

অন্যদিকে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মিত্রবাহিনীর ভারতীয় সৈন্য তখনো বাংলাদেশে অবস্থান গ্রহণ করায় যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার ক্ষেত্রে এক ধরনের দ্বিধার জন্ম দেয়। ১৯৭২ সালের ৬ই মার্চ এ' সম্পর্কে যুক্তরাষ্ট্রের দূরপ্রাচ্য ও দক্ষিণ এশিয়া বিষয়ক ডেপুটি এসিস্টেন্ট সেক্রেটারী ভ্যান জলেন পররাষ্ট্র বিষয়ক সিনেট কমিটিতে বলেন যে, "The Bangladesh case contradicts the tragic background of recent hostilities between India and Pakistan and the still uncertain political and military situation after the war, especially with regard to the continued presence of Indian troops in Bangladesh. Are concerned (Stebbin & Adam 1972: 230)."

অন্যদিকে ১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারী ও মার্চে বঙ্গবন্ধুর ভারত সফর ও সোভিয়েত সফর সম্পর্কে সতর্ক দৃষ্টি রাখছিল যুক্তরাষ্ট্র। বঙ্গবন্ধু ভারত সফরে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেওয়া ভারতীয় সৈন্য প্রত্যাহারের বিষয়ে বলিষ্ঠ পদক্ষেপের মাধ্যমে ১২ মার্চ ১৯৭২ এর মধ্যে মিত্র বাহিনীর সৈন্য প্রত্যাহার প্রক্রিয়া সম্পন্ন হলে যুক্তরাষ্ট্রের স্বীকৃতি আদায়ের পথ অনেকটা সুগম হয়। আবার সোভিয়েত ইউনিয়ন গিয়ে বঙ্গবন্ধু পররাষ্ট্রনীতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে দুটি সোভিয়েত পত্রিকায় দেওয়া স্বাক্ষাতকারে বঙ্গবন্ধু দৃঢ়চিত্তে ঘোষণা করেন, আমাদের পররাষ্ট্রনীতি হবে জোট নিরপেক্ষ। ফলে যুক্তরাষ্ট্রের সংশয় অনেকটাই দূরীভূত হয়। এর ফলে ১৯৭২ সালের ২১শে মার্চ সিনেটে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদানের বিষয়ে একটি রেজুলেশন পাশ হয় (Sharma 2001: 34)।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের ৯০ দিনের মাথায় ১৯৭২ সালের ৪ এপ্রিল যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশকে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি প্রদান করে (Sharma 2001: 36)। বাংলাদেশের স্বীকৃতির বিষয়ে এক স্টেটমেন্টে যুক্তরাষ্ট্রের সেক্রেটারী ও স্টেট উল্লেখ করেন, "America's intention to develop friendly bilateral relations and help Bangladesh when faced with the enormous mission of relief and rehabilitation (New York Times, 5 April 1972)."

এরপর যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নিক্সন বঙ্গবন্ধুকে এক পত্রে দু'দেশের সম্পর্কের বিষয়ে উল্লেখ করেন, "Historically there were heat ties together along with your people. The USA is preserving an respectable project in Dacca considering that 1949 and over time many Americans, each in personal and respectable capacity, have favored delight to paintings facet via way of means of facet with the Bengali people (Times of India, 9 April 1972)."

বঙ্গবন্ধু যুক্তরাষ্ট্রের স্বীকৃতিকে স্বাগত জানায় এবং দু'দেশের মধ্যে আনুষ্ঠানিক কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। যুক্তরাষ্ট্রের স্বীকৃতি অর্জনের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি সমুন্নত হয়। এবং অল্প সময়ের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থনে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (IMF), বিশ্বব্যাংক এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) এর সদস্য পদ লাভ করে (For a list of the world organisations to which Bangladesh was admitted in 1972: 57)।

অন্যদিকে দু'দেশের মধ্যে আনুষ্ঠানিক সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ার পর ১৯৭২ সালের জুলাই মাসে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বাংলাদেশে সার্বিক সহযোগিতার লক্ষ্যে বাংলাদেশে জন কনালির নেতৃত্বে একটি বিশেষ এনভয় প্রেরণ করেন। প্রতিনিধিদল বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্দুস সামাদ আজাদের সাথে বৈঠকে সার্বিক সহযোগিতার আশ্বাস দেন (Baxter 1984: 107)।

এরপর আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থা (AID) ঢাকায় তাদের অফিস স্থাপন করে। ১৯৭২ সালের মে মাসে বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্র প্রথম দ্বি-পাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় যার মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশকে ৯০ মিলিয়ন ডলার সহায়তা প্রদান করে (Sharma 2001: 39)। ১৯৭৩ সালের ৩০ জুনের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশকে প্রায় ৪৪৩ মিলিয়ন ডলার সহায়তা প্রদান করে যা ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা অর্জনের পর থেকে প্রাপ্ত বৈদেশিক সহায়তার এক-তৃতীয়াংশের সমান ছিল (United States Assistance to Bangladesh from Independence to 30 June 1973: 3)। এমনিভাবে বঙ্গবন্ধুর দক্ষ কূটনৈতিক কৌশলের কারণে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে।

জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ

জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ বঙ্গবন্ধুর পররাষ্ট্রনীতির অন্যতম সফলতা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কেননা জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর স্বীকৃতি অর্জনের কূটনীতি পূর্ণতা লাভ করে। তবে এ অর্জন খুব সহজ ছিল না। নানা রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক সমীকরণের মাধ্যমে বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করার পরবর্তী সময় থেকেই পাকিস্তান ও চীন বাংলাদেশ বিরোধী অপপ্রচার শুরু করে। এমন কি বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করার পূর্বেই ১৯৭১ সালের ২১ ডিসেম্বর পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জুলফিকার আলী ভুট্টো নিরাপত্তা পরিষদের সরকার প্রধানদের নিকট এক আবেদনে ভারতীয় বাহিনীর নৃসংশতা ও দখল দারিত্বের বিষয় তুলে ধরে (Ahmed 2011: 26)। মূলত এর মাধ্যমে পাকিস্তান বাংলাদেশ বিরোধী অপপ্রচার শুরু করে। একই সাথে চীন নিরাপত্তা পরিষদের সভাপতি বরাবর এক পত্রে পূর্ব পাকিস্তানে ভারতীয় বাহিনীর হত্যাযজ্ঞ ও পাকিস্তানী নাগরিকদের উপর নির্যাতন চালানোর বিষয় তুলে ধরে (Ahmed 2011: 26)।

বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্য না হওয়ায় পাকিস্তানের অপপ্রচারের জবাবে ১৯৭২ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারী ভারতের মাধ্যমে প্রেরিত এক বিবৃতিতে এই সব অপপ্রচারের প্রতিবাদ জানায় (Ahmed 2011: 27)। ১৯৭১ সাল থেকেই জাতিসংঘ বাংলাদেশে তাদের কার্যক্রম শুরু করে। স্বাধীনতা অর্জন পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের মানুষের দূর্ভোগ লাঘব ও বিপুল সংখ্যক উদ্বাস্তুকে সহায়তা করার লক্ষ্যে ১৯৭২ সালের মার্চ মাসে জাতিসংঘ মানবিক কার্যক্রম শুরু করে এবং গঠিত হয় United Nation Relief Operation in Dhaka (UNROD) নামক জাতিসংঘের ত্রাণ ও পুনর্বাসন সংস্থা (ইসলাম ২০২০: ২৬৬)।

বাংলাদেশ তখন জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ না করলেও জাতিসংঘের বিভিন্ন অঙ্গসংস্থা বাংলাদেশ পুনর্গঠনে কার্যক্রম শুরু করে। ফলে বাংলাদেশের জাতিসংঘের স্বীকৃতি আদায় ও সদস্যপদ লাভ করার পথ সুগম হয়। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্দুস সামাদ আজাদ ১৯৭২ সালের জুলাই মাসের প্রথম দিকে তার বাসভবনে জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভের বিষয় অনুকূল পরিবেশ ব্যাখ্যা করে সাংবাদিকদের বলেন যে, "নিরাপত্তা পরিষদের ১৫টি দেশের মধ্যে ১১টি দেশ বাংলাদেশকে স্বীকৃতি

দিয়েছে। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, বাকি চারটি দেশ বাংলাদেশের বাস্তবতা স্বীকার করে নিবে (ইসলাম ২০২০: ২৬৮)। ১৯৭২ সালের জুলাই মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান চিকিৎসার জন্য লন্ডন যাত্রার প্রক্কালে নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য রাষ্ট্র প্রধানদের নিকট প্রেরিত পত্রের মাধ্যমে তিনি বাংলাদেশের জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভের বিষয় তাদের সমর্থন কামনা করেন (ইসলাম ২০২০: ২৬৯)।

১৯৭২ সালের ৮ আগস্ট বাংলাদেশ আনুষ্ঠানিকভাবে জাতিসংঘের সদস্যপদের জন্য আবেদন করে। মন্ত্রী পরিষদের সিদ্ধান্ত ও প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অনুমোদনের পর জাতিসংঘ মহাসচিবের নিকট এক তার বার্তায় এ আবেদন করা হয়। এরপর মূল আবেদনের একটি অনুলিপি ঢাকায় জাতিসংঘের প্রতিনিধি ড. উমব্রিখটের নিকট এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত জনাব এস এ করিমের মাধ্যমে আর একটি অনুলিপি প্রেরণ করা হয় (ইসলাম ২০২০: ২৭০)। বাংলাদেশ জাতিসংঘে সদস্যপদ লাভের জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে আবেদন করার পর বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জাতিসংঘের সকল সদস্য রাষ্ট্রের প্রতি বাংলাদেশকে সমর্থন করার আহবান জানিয়ে বলেন যে, "বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভের সকল শর্ত ও যোগ্যতা পূরণ করেছে (Mustofa & Kabir 2013: 52)।"

বাংলাদেশের আবেদনের পর নিরাপত্তা পরিষদের ৫৯ রুল অব প্রসিডিউর অনুযায়ী নিরাপত্তা পরিষদ বাংলাদেশের আবেদনটি নিরাপত্তা পরিষদের নতুন সদস্য অন্তর্ভুক্তি বিষয়ক কমিটিতে প্রেরণ করে (Ahmed, 2011: 28)। রেফারেল বিতর্কে ভারত, যুগোস্লাভিয়া ও সোভিয়েত ইউনিয়ন বাংলাদেশের পক্ষে কথা বলে অন্যদিকে চীন বাংলাদেশের আবেদন বিবেচনার নিরাপত্তা পরিষদের সিদ্ধান্তের কঠোর বিরোধীতা করে (Ahmed, 2011: 28)। ২৩ আগস্ট ১৯৭২ নিরাপত্তা পরিষদের নতুন মেম্বার ভর্তি কমিটি নিরাপত্তা পরিষদে রিপোর্ট প্রদান করে অবগত করে যে, ১১ এবং ২১ আগস্ট দুটি রুদ্ধদার বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। আর্জেন্টিনা, বেলজিয়াম, ফ্রান্স, ভারত, ইতালী, জাপান, পানামা, সোভিয়েত ইউনিয়ন, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, যুগোস্লাভিয়া বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে সমর্থন প্রদান করেছে এবং বাংলাদেশ আর্টিকেল ৪ এর সকল শর্ত পূরণ করেছে। চীন তার পূর্বের অবস্থানে অনড় থাকে। ২৫ আগস্ট ১৯৭২ উক্ত কমিটি সদস্যদের মতামতের জন্য ভোটের আয়োজন করে। ১১ সদস্য রাষ্ট্র বাংলাদেশের পক্ষে মত প্রদান করে, গায়ানা বাংলাদেশের বিপক্ষে অবস্থান নেয়। চীন, সোমালিয়া, সুদান বাংলাদেশ বিরোধী অবস্থানে অনড় থাকে এবং চীন পূর্ব থেকেই বাংলাদেশের আবেদন বিবেচনার বিরোধীতা করে আসছিলো (Ahmed, 2011: 29)।

২৫ আগস্ট ১৯৭২ নিরাপত্তা পরিষদে এক রিপোর্ট পেশ করে অবগত করে যে, সার্বিক পরিস্থিতি রিভিউ করে নিরাপত্তা পরিষদ বাংলাদেশের সদস্যপদ লাভের আবেদন বিবেচনা করছে না (Ahmed, 2011: 30)। নিরাপত্তা পরিষদের রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে সাধারণ পরিষদ ১৯৭২ সালের অধিবেশনে কোন রকম বিতর্ক কিংবা ভোট ব্যতিত দুটি রেজুলেশন গ্রহণ করে যার একটি হচ্ছে বাংলাদেশের জাতিসংঘের অন্তর্ভুক্তি বিষয়ক রেজুলেশন ২৯৩৭ যা ২৩টি দেশ অনুমোদন দেয় অপরটি শীঘ্রই বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করবে এই আশা ব্যক্ত করে সাধারণ পরিষদের রেজুলেশন ২৯৩৮ যা ১৬টি দেশ সমর্থন করে (Ahmed, 2011: 30)। ফলে চীনের বিরোধীতার কারণে বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করতে ব্যর্থ হয়।

এরপর বাংলাদেশ বিভিন্ন কূটনৈতিক তৎপরতার মাধ্যমে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির প্রচেষ্টা চালায়। ১৯৭৪ সালের জুনে বাংলাদেশ পুনরায় জাতিসংঘের সদস্যপদের জন্য আবেদন করে। ১০ জুন ১৯৭৪ নিরাপত্তা পরিষদে বাংলাদেশের সদস্যপদের আবেদনটি উপস্থাপিত হলে সর্বসম্মতিক্রমে তা গৃহীত হয়। এবার চীন বাংলাদেশের বিপক্ষে অবস্থান গ্রহণ না করে ভোট প্রক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ থেকে বিরত থাকে (কালের কণ্ঠ, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২০)।

নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশক্রমে ১৭ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪ সাধারণ পরিষদ সর্বসম্মতিক্রমে একটি রেজুলেশন গ্রহণ করে এবং বাংলাদেশ জাতিসংঘের ১৩৬-তম সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয় (Ahmed, 2011: 31)।

উপসংহার

সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির দর্শন ও লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণে বঙ্গবন্ধুর সামনে নানাবিধ চ্যালেঞ্জ ও প্রতিবন্ধকতা বিরাজমান ছিল। একদিকে মুক্তিসংগ্রামে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে সহায়তাকারী মিত্রশক্তি ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়ন বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারণে একটি ফ্যাক্টরে পরিণত হয়। অন্যদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের ক্রমাগত বাংলাদেশ বিরোধী অবস্থান বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারণের জন্য একটি বড় প্রতিবন্ধকতা হিসেবে পরিলক্ষিত হচ্ছিলো। এর বাইরে মুসলিম বিশ্বের দেশগুলিতে পাকিস্তান বাংলাদেশ বিরোধী অপপ্রচার চালিয়ে আর এক বিভক্তি তৈরী করে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর ব্যক্তিত্ব, নেতৃত্ব ও রাজনৈতিক প্রজ্ঞার মাধ্যমে বাংলাদেশের জন্য একটি বাস্তবসম্মত পররাষ্ট্রনীতির ভিত্তি রচনা করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

তথ্যসূত্র

আজাদ, আবুল কালাম (২০২১), *বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি যেভাবে অর্জিত হয়।*

ইমাম, এইচ টি (২০১৩), *বাংলাদেশ সরকার* ১৯৭২-৭৫, ঢাকাঃ হক্কানী পাবলিশার্স, পৃ. ২৬৮-৬৯।

ইসলাম, ড. মোহাম্মদ জহুরুল (২০২০), *বঙ্গবন্ধুর পররাষ্ট্রনীতি*, ঢাকাঃ আগামী প্রকাশনী, পৃ. ১৮৫।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ২০১৬, পৃ. ৭।

দৈনিক সংবাদ, ৯ আগস্ট ১৯৭২।

মোহাম্মদ, সেলিম (২০০৯), *বাংলাদেশ ভারত সম্পর্ক*, ঢাকাঃ বাংলা একাডেমি, পৃষ্ঠা নং-৮৭।

রহমান, এ কে এম আতিকুর, *জাতিসংঘে বাংলাদেশের সদস্য পদ লাভ*, *কালের কণ্ঠ*, ১৭ অক্টোবর ২০২০।

সাকী, মোহাম্মদ গোলাম সাকলায়েন, *"ইসলামী সম্মেলন সংস্থায় বাংলাদেশ"*, আহমেদ, শরীফ উদ্দিন আহমেদ (সম্পা.) (১৯৯৫-১৯৯৭), *ইতিহাস সমিতি পত্রিকা*, ঢাকাঃ *বাংলাদেশ ইতিহাস সমিতি*, সংখ্যা ২৩-২৪, পৃ. ২১১।

হোসেন, সৈয়দ আনোয়ার (২০১৭), *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বৃহৎশক্তিবর্গের ভূমিকা*, ঢাকাঃ জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, পৃ-২৬।

A tribute to Bangabandhu's foreign policy, Available from: https://dailyasianage.com/news/135593/a-tribute-to-bangabandhus-foreign-policy

Adam, Stebbins, Richard P. and Elaine P. (eds.) (1972), *American Foreign Relations 1972: A Documentary Record,* New York: Council of Foreign Relations, pp. 230.

Ahmed, Imtiaz (2011), *Bangladesh Foreign Policy: Constraints, Compulsions and Choices*, BIISS Journal, 32 (3), PP. 207-218.

Ahmed, Shamim (2011), *Bangladesh and the United Nations Common Principles, Shared Values,* Dhaka: The University Press Limited, pp. 26.

Bangladesh Document, (UPl edition) (1999), 2, Govt. Of India, Ministry of External Affairs, pp. 605.

Bangladesh Observer, 13 February 1974.

Baxter, Craig (1984), *Bangladesh: A New Nation in an Old Setting,* Bolder Colorado: Fredric A. Praeger, West-view Press, pp. 107.

Bjol, Erling (eds.) (1971), "*The Small States in International Politics", in August Schou and Arne Olav*", Small States in International Relations, Stockholm: Almqvist and Wiksell, 19, PP, 33.

For a list of the world organisations to which Bangladesh was admitted in 1972, see Government of the Peoples's Republic of Bangladesh, *Bangladesh Progress 1972,* Dhaka: Department of Publications, Ministry of Information and Broadcasting, pp. 57.

Global Security, *Sheikh Mujibur Rahman, 1972-75,* Available from: https://www.globalsecurity.org/military/world/bangladesh/index.html

Government of the United States (24 April 1972), *Department of State Bulletin,* Washington DC, Department of State, pp. 597.

Hussain, Sayed Anwar, *'Bangladesh and Islamic Countries, 1972-82'*, New Delhi: Asian Publisher, pp. 137.

Kabir, Mustofa, Golam and M.M. (ed.) (2013), *Bangabondhu Regime Major Events 16 December 1871-15August 1975,* Dhaka: Hakkani Publishers, PP. 32.

Marijke, Breuning (2007), *Foreign Policy Analysis: A Comparative Introduction.*US: Palgrave Macmillan US, PP. 30.

Michael, Foley (2013), *Political Leadership: Themes, Contexts, and Critiques*. Oxford University Press, PP. 5-6.

Morning News, 6 February 1974.

New York Times, 5 April 1972.

Nixon's statement at a news conference on 10 February 1972 as reported in *Department of State Bulletin,* 6 March 1972, p. 292.

Parliamentary Debates (1974), 111 & 77 (1).

Rowman & Littlefield, PP. 10.

S. Day, M. Hudson, Valerie, Benjamin (2014), *Foreign Policy Analysis: Classic and Contemporary*, Second Edition,

Sharma, Sarbjit (2001), *US-Bangladesh Relations: A Critique*, Dhaka: The University Press Limited, pp. 34.

Sharma, Sarbjit (2001), *US-Bangladesh Relations: A Critique,* Dhaka: The University Press Limited, pp. 39.

The letter was handed over to Mujib by Herbert Spivac, Head of the Mission in Dhaka, on 8 April. The conciliatory attitude of the US government towards Bangladesh was now clearly apparent. See *Times of India* (New Delhi), 9 April 1972.

United States Assistance to Bangladesh from Independence to 30 June 1973, Dhaka: US Office of the Coordinator of Relief and Rehabilitation, pp. 3.

Yarger, Harry R. (2006), *Strategic Theory of for the 21st Century: The Little Book on Big Strategy,* Carlisle, PA: Strategic Studies Institute, pp. 2.

[Abstract : The role of A National Leader is very important in determining the foreign policy objectives of a country. A national leader's personality, political wisdom, and outlook on international politics play a vital role in foreign policy formulation. After independence, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman showed outstanding skills in determining the foreign policy of Bangladesh in the political reality of the time. Bangabandhu's strong personality, political wisdom, and strategic decisions enabled him to lay the foundations of a pragmatic foreign policy for Bangladesh. My article presents Bangabandhu's foreign policy decision-making process, his political wisdom, and strategic decision-making by analyzing the theoretical framework.]